কৈশোর

জীবন গড়ার সঠিক সময়

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা সহায়িকা

কৈশোর

জীবন গড়ার সঠিক সময়

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা সহায়িকা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: **কাজী মোস্তফা সারোয়ার**
মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

পৃষ্ঠপোষক: **ড. আশরাফুন্নেছা**
পরিচালক, আইইএম
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা: (১ম সংস্করণ)
গাজী আকতার জাহান
সিপিআরও, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোশাররফ কামাল
পিসিও, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ
NPPP (BCC & Advocacy), UNFPA

(২য় সংস্করণ) :
জাকিয়া আখ্‌তার
উপ-পরিচালক (পিএম), আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোহাম্মদ বাদশা হোসেন
পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ
সিঃ কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইউএসএআইডি উজ্জীবন প্রজেক্ট

(৩য় সংস্করণ) :
আব্দুল লতিফ মোল্লা
উপ-পরিচালক (পিএম), আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোহাম্মদ ফখরুল আলম
সিপিআরও এবং ডিপিএম, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
খন্দকার আবু জাফর মোঃ ছালেহ
সিঃ কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইউএসএআইডি উজ্জীবন প্রজেক্ট

চিত্রাঙ্কন ও ডিজাইন: **মোঃ মাহফুজার রহমান**
ডিজাইনার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রকাশকাল: ১ম সংস্করণ-মে, ২০০৭
২য় সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
৩য় সংস্করণ-জুন, ২০১৯

প্রকাশক: আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মুদ্রণে: প্রেস শাখা
আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশই ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী। কোন ধরনের প্রস্তুতি এবং প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান ছাড়াই এদের এক বিরাট অংশ কৈশোর কালেই বিয়ে, গর্ভধারণ এবং মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌনরোগের উচ্চহার, সর্বোপরি ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের সম্যক ধারণা না থাকায় এই বিশাল জনগোষ্ঠী আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার সম্মুক্ষীণ হচ্ছে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বিয়ের আইনগত ন্যূনতম বয়স বাস্তবায়ন ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত অংগীকার বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে ২০৩টি কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার স্থাপন করা হবে। সরকারের এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি সংস্থা জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আইইএম ইউনিট কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকাল, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এইচআইভি-এইডস এবং জেন্ডার বিষয়ক সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্ত সম্বলিত এই তথ্য সহায়িকাটির (Booklet) নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি আশা করি, এই তথ্য সহায়িকাটি বয়ঃসন্ধিকাল, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি-এইডস এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি তথ্য সহায়িকাটির নতুন সংস্করণ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কাজী মোস্তফা সারোয়ার
মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রাককথন

মানুষের জীবনের ভিত্তি রচিত হয় কৈশোরে। সারা জীবনের সুস্থতাও অনেকখানি নির্ভর করে বয়ঃসন্ধিকালের প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ওপর। এ বয়সে কিশোর-কিশোরীরা পারিবারিক জীবনে যে শিক্ষা পায় তাই সে পরবর্তী জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ রচনা করে। প্রয়োজনীয় তথ্য ও সচেতনতার অভাবে সামান্য ভুলও কিশোর-কিশোরীর ভবিষ্যৎ জীবনকে সংকটাপন্ন করে দিতে পারে। এদেশের কিশোর-কিশোরীরা যেমন বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা সম্পর্কে খুব কমই সচেতন, একইভাবে তাদের পিতা-মাতা কিংবা সমাজের অন্যান্য অভিভাবকগণ এ বিষয়ে আলোচনায় এখনো তেমন উৎসাহী নয়। আজকের কিশোর-কিশোরীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এদের সুস্থ, সুন্দর এবং নিরোগ জীবন আমাদের সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিতে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট কর্তৃক কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর এই পুস্তিকাটির মুদ্রণ অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ।

আমি মনে করি, স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত কর্মশালাসহ সেবাকেন্দ্রে আগত কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের মাঝে এই পুস্তিকাটি সরবরাহ করা সম্ভব হলে বয়ঃসন্ধিকাল, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এইচআইভি ও এইডস এবং জেন্ডার বিষয়ে তারা আরও সচেতন হবেন। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর তারই ক্ষুদ্র উদ্যোগের একটি হলো এই প্রকাশনাটি। আমি প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ড. আশরাফুন্নেছা
পরিচালক
আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ০১-০২

২. বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর ০৩-০৮
- ২.১ বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন
- ২.২ বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন
- ২.৩ কৈশোরের ঝুঁকি
- ২.৪ ঝুঁকি প্রতিকারে করণীয়

৩. জেন্ডার (Gender) ধারণা ০৯-১৪
- ৩.১ ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ
- ৩.২ বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে করণীয়

৪. কৈশোরকালীন পুষ্টি ১৫-১৮
- ৪.১ পুষ্টি কি?
- ৪.২ পরিবারে যা মেনে চলতে হবে

৫. কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ১৯-২৪
- ৫.১ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা
- ৫.২ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে করণীয়
- ৫.৩ প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার করণীয়
- ৫.৪ মাসিক বা ঋতুস্রাব কি?
- ৫.৫ মাসিক বা ঋতুস্রাবের সময় করণীয়
- ৫.৬ স্বপ্নদোষ কি?
- ৫.৭ নিরাপদ যৌন আচরণ
- ৫.৮ নিরাপদ যৌন আচরণের জন্য করণীয়

সূচিপত্র

৬. বাল্যবিয়ে, প্রজননতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ২৫-৩০

- ৬.১ বাল্যবিয়ে কি?
- ৬.২ বাল্যবিয়ের পরিণতি
- ৬.৩ বাল্যবিয়ে হয়ে গেলে করণীয়
- ৬.৪ প্রজননতন্ত্র, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ
- ৬.৫ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ হলে করণীয়

৭. এইচআইভি ও এইডস কি? ৩১-৩৪

- ৭.১ এইচআইভি কিভাবে ছড়ায়
- ৭.২ এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় না
- ৭.৩ এইডস এর লক্ষণসমূহ
- ৭.৪ এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে করণীয়

৮. পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ ৩৫-৩৮

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর-কিশোরী। এই কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করছে দেশের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

শৈশব ও যৌবন এ দু'য়ের মাঝে কৈশোরকাল একটি সেতুর মতো কাজ করে। কিছুদিন আগেও যে শিশুটি মা-বাবা ও পরিবারের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বেড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে সে বাইরের পরিবেশে মিশতে শুরু করে। একই সময়ে তার শরীর এবং মনেও আসে নানা ধরনের পরিবর্তন। সবকিছু মিলিয়ে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করে সে। কৈশোরের শিক্ষা, জ্ঞান ও অভ্যাস তার পরবর্তী জীবনের উপর অনেক প্রভাব ফেলে। কাজেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে কিশোর-কিশোরীদের যেমন সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন তেমনিভাবে মা-বাবা, পরিবার তথা সমাজের সবাইকে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এখনই এগিয়ে আসা জরুরি।

কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এ সময় বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অনেক সময় তারা লজ্জা, সংকোচ বা ভয়ে এসব বিষয়ে কারো সাথে কথা বলে না- ফলে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব জটিলতা এড়ানোর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ্ কর্নার' বা 'কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার'-এর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক তথ্য দেওয়ার লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন: বই, পোস্টার, ব্রশিউর, স্টিকার ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। এই প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহায়িকাটি তেমনই একটি উপকরণ।

২. বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর

বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty) প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের শরীর ও মনে নানা ধরণের পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং যৌবনে এসব পরিবর্তনগুলো পূর্ণতা লাভ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময় হচ্ছে কৈশোর (Adolescence)। অর্থাৎ কৈশোর বলতে বয়ঃসন্ধিকালের শুরু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। এই বয়সে ছেলেদের কিশোর ও মেয়েদের কিশোরী বলা হয়।

২.১ বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়ে উভয়ের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইসব পরিবর্তন নিয়ে লজ্জা-সংকোচ বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

সাধারণত যেসব শারীরিক পরিবর্তন হয় সেগুলো হলো:

কিশোরীদের ক্ষেত্রে

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- স্তন বৃদ্ধি পায়
- বগল ও যোনি অঞ্চলে লোম গজায়
- ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয়
- যৌনাঙ্গ বড় হয়
- কোমর সরু হয়
- উরু ও নিতম্ব ভারী হয়
- জরায়ু ও ডিম্বাশয় বড় হয়।

কিশোরদের ক্ষেত্রে

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ বড় হয়
- বগল ও লিঙ্গ অঞ্চলে লোম গজায়
- দাড়ি-গোঁফ গজায়
- হাত-পায়ের লোম গাঢ় হয়
- বুকে লোম গজায়
- বুক ও কাঁধ চওড়া হয়
- কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়
- বীর্য উৎপাদন ও স্বপ্নদোষ শুরু হয়।

সবার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো একই সময়ে ও একই রকম নাও হতে পারে। যেমন- কিশোরীদের ক্ষেত্রে কারো আগে আবার কারো একটু বেশি বয়সে মাসিক শুরু হতে পারে। স্তন বৃদ্ধি একেক জনের একেক রকম হতে পারে। কিশোরদের ক্ষেত্রে একেক জনের উচ্চতা একেক রকম হতে পারে। সবারই বুকে, হাত-পায়ে লোম গাঢ় নাও হতে পারে। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

২.২ বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা ধরনের মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সময়ের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা এইসব পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

সাধারণত যেসব মানসিক পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলো হলো:

- অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে
- চলাফেরায় চঞ্চলতা বাড়ে
- স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে
- আবেগে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন-কখনো মন চঞ্চল হয় আবার
- কখনো বিষণ্ন হয়।
- কেউ কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসে
- বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের কারণে লাজুকভাব বেড়ে যায়
- নানা ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা কাজ করে
- সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ে
- বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে
- যৌন বিষয়ে চিন্তা আসে।

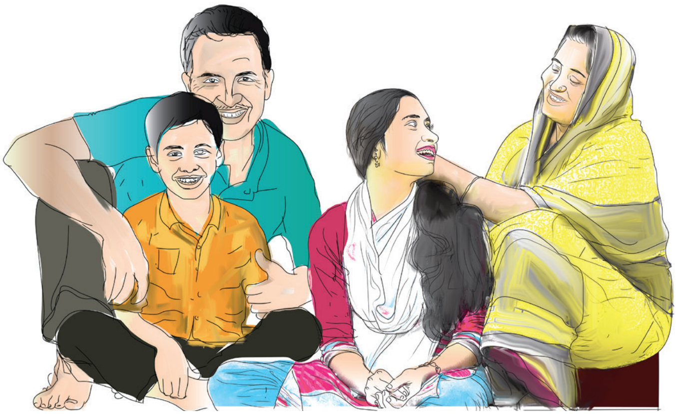

২.৩ কৈশোরের ঝুঁকি

কৈশোরে কিশোর-কিশোরীদের অনেক অজানা বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সময় কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা নতুন অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করে যার পরিণতি সব সময় ভাল নাও হতে পারে। এছাড়াও সঠিক জ্ঞানের অভাবে কখনো কখনো তারা ভুল সিদ্ধান্তও নিতে পারে। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের মনে রাখতে হবে তাদের সবচাইতে ভাল বন্ধু মা-বাবা ও বড় ভাই-বোন। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে তারা তাদের সঠিক জ্ঞান দেয়ার পাশাপাশি সঠিক পথ দেখাতেও সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন।

কিশোর-কিশোরীরা সাধারণত যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন বেশি হয় সেগুলো হলো:

- বন্ধু-বান্ধবদের চাপে পড়ে তারা বিপদজনক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।
- কৌতুহল বশে বা অসৎ সঙ্গে পড়ে ধূমপান, মাদকাসক্তি, অনিরাপদ যৌন আচরণসহ নানা ধরণের অসামাজিক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।
- নিকট আত্মীয় অথবা অপরিচিতজন দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে।
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রজননতন্ত্রে নানা ধরণের রোগ সংক্রমণ বা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের মতো ঝুঁকি সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

২.৪ ঝুঁকি প্রতিকারে করণীয়

- কৈশোরে বন্ধু-বান্ধব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সময় নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে বুঝতে হবে কোন কাজটি ভাল এবং কোনটি ভাল নয়। বন্ধু-বান্ধবদের চাপে বা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- বাবা-মা, ভাই-বোন সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে কিংবা কোনো সমস্যায় পড়লে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে হবে।
- পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে বেশি নিয়োজিত

রাখতে হবে; যাতে বিপদজনক বা অসামাজিক কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা যায়।

- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে সেগুলো মেনে চলতে হবে।
- কোন আত্মীয় অথবা পরিচিত/অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা কিশোর-কিশোরীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে। তাই বাবা-মাকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

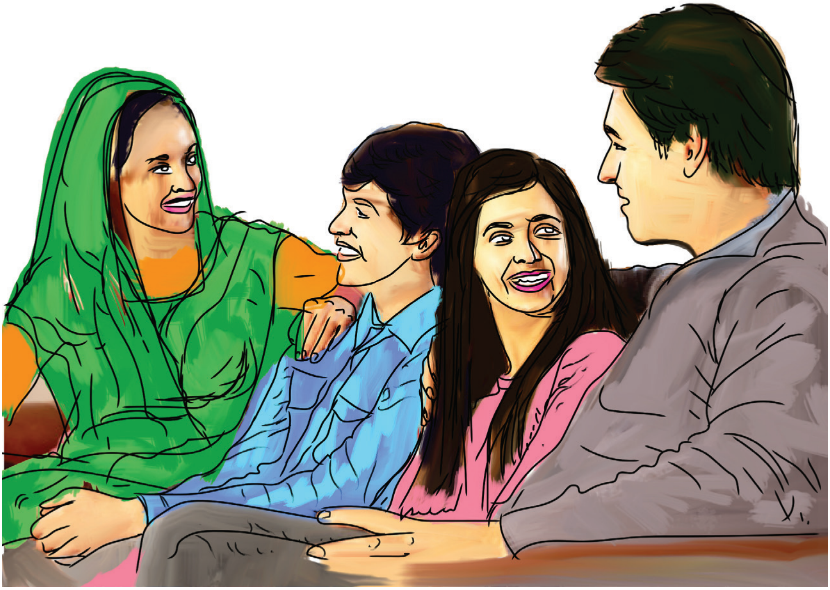

৩. জেন্ডার (Gender) ধারণা

ছেলে ও মেয়েশিশু উভয়েই সমান সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তারা সব ধরনের কাজই করতে পারে। শুধুমাত্র শারীরিক কিছু পার্থক্য ছাড়া ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকেনা। শারীরিক এই পার্থক্যের কারণে মেয়েরা সন্তান জন্ম দিতে পারে অন্যদিকে ছেলেরা ভ্রুণ উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। প্রকৃতিগত এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে সমাজে ছেলে আর মেয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গড়ে ওঠে। সামাজিকভাবে আরোপিত ছেলে-মেয়ের এই পরিচয় ও তাদের ভূমিকাকেই জেন্ডার বলে।

যেমন-এক সময়ে বেশিরভাগ মেয়েরা রান্না, ঘরের কাজ, সন্তান লালন-পালন এইসব কাজ করতো, অন্যদিকে ছেলেরা আয়-উপার্জন, বিচার-শালিস, রাজনীতি ইত্যাদি কাজ করতো। এই পার্থক্যের ফলে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। ফলে, সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরণের বৈষম্যমূলক সামাজিক ভূমিকা ও আচার-আচরণ।

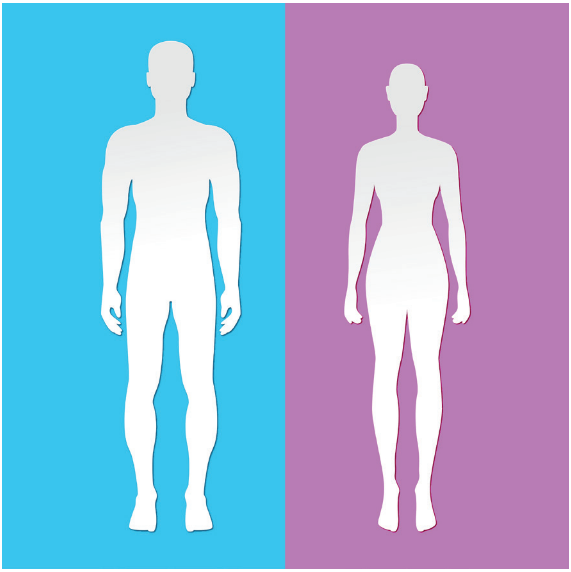

৩.১ ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ

আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে এবং মেয়েকে সমান চোখে দেখা হয়না। মেয়ে শিশুদের প্রতি অযত্ন অর অবহেলা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসা সব ক্ষেত্রেই অবহেলার শিকার হয় মেয়েরা। ফলে সমান সম্ভাবনা থাকার পরও একটি মেয়ে একটি ছেলের মত একইভাবে দক্ষ হয়ে বেড়ে উঠতে না পেরে পদে পদে সে পিছিয়ে পড়ে। অথচ যথাযথ সুযোগ পেলে উভয়ই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের সমাজে সাধারণত মেয়ে আর ছেলের মধ্যে যে ধরণের বৈষম্য দেখা যায় সেগুলো হলো:

পুষ্টি: বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শরীর দ্রুত বাড়ে তাই এ সময়ে উভয়েরই প্রচুর আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার প্রয়োজন। তবে আমাদের পরিবারগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, তারা ছেলেকে বেশি খাবার দেয় কিন্তু মেয়ের পর্যাপ্ত খাবারের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, ফলে মেয়েটি অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে ওঠে।

শিক্ষা: পরিবারে একটি মেয়ে যখন বড় হয়ে ওঠে তখন ধরে নেয়া হয় সে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হয়েছে, সুতরাং তার আর লেখাপড়ার দরকার নেই। এছাড়াও রাস্তা ঘাটে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে জীবন গঠনে বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে একটি মেয়ে ছেলেদের চাইতে বরাবরই পিছিয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা: স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। দেখা যায় একটি ছেলে অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু মেয়েকে সহজে ডাক্তারের কাছে নেয়া হচ্ছে না। এমনকি গর্ভাবস্থায়ও তার সঠিক যত্ন নেয়া হয়না। এর কুফল একটি মেয়ে সারাজীবন ভোগ করে।

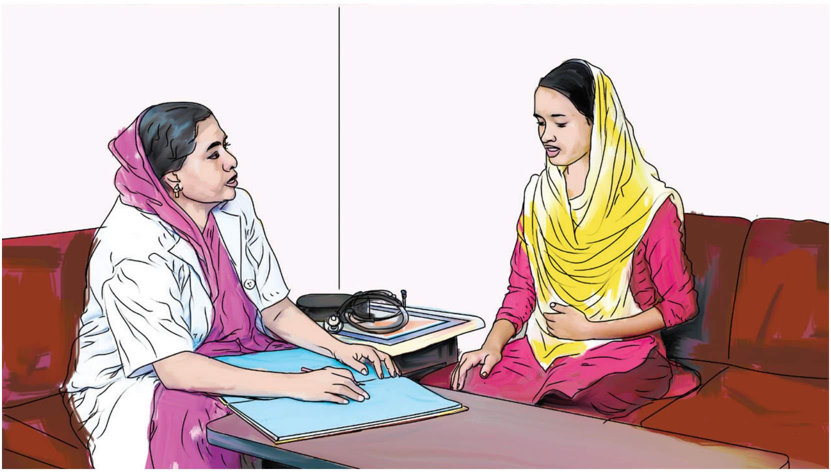

মর্যাদাবোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: অনেক সময় ছোটবেলা থেকেই একটি মেয়েকে পরিবারে খাটো করে দেখা হয়, ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয়না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাকে অবহেলা করা হয়। এভাবে মর্যাদাহীনভাবে বেড়ে উঠতে উঠতে মেয়েরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো নিজের মর্যাদা বা অধিকারও বুঝতে পারে না।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা: ছোট-বড় কোনো ধরনের কাজেই মেয়েদের মতামতের কোনো মূল্য অনেক পরিবারের সদস্যরা দেয়না। যেমন-মেয়ের অমতে বিয়ে দেয়া, লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিশতে না দেয়া, খেলাধুলা করতে না দেয়া, অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

সম্পদ বণ্টন বা নিয়ন্ত্রণ: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারে মেয়েরা তার উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দেখা যায় পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যরাও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে ধরে নেন সম্পত্তিতে শুধুমাত্র ছেলেদেরই অধিকার রয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে পারিবারিক ও সামাজিক চাপে মেয়েদের এটা মেনে নিতে হয়।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য: কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে এই অধিকার প্রতি মুহূর্তেই লঙ্ঘিত হচ্ছে। দেখা যায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একই কাজ করছে কিন্তু তাদেরকে পারিশ্রমিক একই রকম দেয়া হচ্ছে না। মেয়েরা যখন গর্ভবতী হচ্ছে তখন তাকে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। এমন কি কখনো কখনো মেয়েটি চাকরি হারাচ্ছে। মনে রাখতে হবে কর্মসংস্থান সকল মানুষের মৌলিক অধিকার।

প্রজনন অধিকার: প্রত্যেক নারী-পুরুষেরই প্রজনন অধিকার যেমন-উপযুক্ত বয়সে বিয়ের অধিকার, সে কখন, কয়টি সন্তান নিতে চান সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এবং তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অথচ আমাদের দেশের মেয়েরা প্রায়ই এই তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩.২ বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে করণীয়

- কিশোর-কিশোরী উভয়কেই **'ছেলে ও মেয়ের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার'** এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ করে কিশোরীদের মা-বাবা বা অভিভাবকদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে বোঝাতে হবে যে, একজন মেয়েও সুযোগ পেলে ছেলের মতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বাবা-মা'র মতামতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে হবে।

- সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী একজন কিশোরীকে লেখাপড়া ও অন্যান্য ভাল কাজ দিয়ে নিজেকে তৈরি করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে একজন পুরুষের পাশাপাশি তারও মাথা উঁচু করে চলার ক্ষমতা থাকে।
- পরিবারের নারী সদস্যদের প্রতি কিশোরদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। একজন কিশোরকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাড়িতে কোনো কিশোরী বোন বা আত্মীয় থাকলে সে যেন তার মতোই খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা, মতামত দেয়ার স্বাধীনতা, মানমর্যাদা ইত্যাদি পায়।
- রাস্তা-ঘাটে কিশোরীদের উত্ত্যক্ত করা, বাজে মন্তব্য বা ইভটিজিং করা থেকে একজন কিশোরকে বিরত থাকতে হবে এবং বন্ধুকেও বিরত থাকতে বলতে হবে।

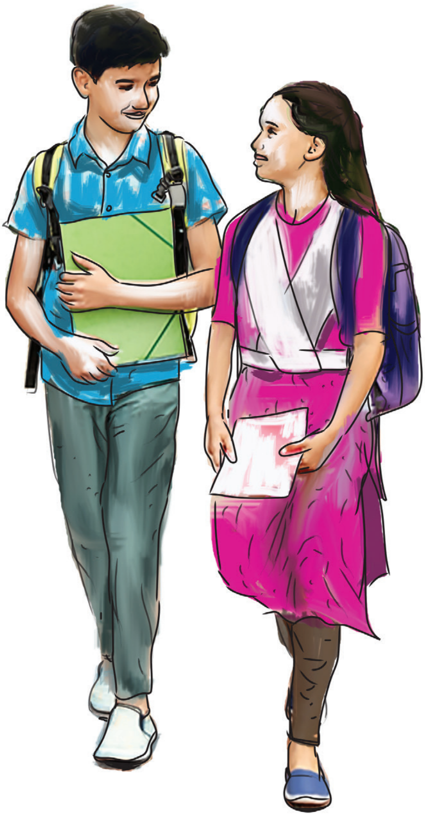

৪. কৈশোরকালীন পুষ্টি

৪.১ পুষ্টি কি?

সুষম খাদ্য বলতে আমরা বুঝি প্রতিবেলার খাবরে ৫৫-৭৫ ভাগ শর্করা জাতীয় খাবার, ১০-১৫ ভাগ আমিষ জাতীয় খাবার ও ১৫-৩০ ভাগ স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাবার এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য আঁশ (Dietary fibre) ও পানি (প্রতিদিন ৮ গ্লাস) খাওয়া।

কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলাও করে থাকে। তাই শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানের জন্যে বয়স ও দৈনন্দিন কাজের পরিমাণ অনুযায়ী ক্যালরি কম বা বেশি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যার বয়স কম বা কাজ কম করে সে কম ক্যালরি ও যার বয়স বেশি এবং বেশি কাজ করে সে বেশি ক্যালরি গ্রহণ করবে।

শর্করা জাতীয় খাবার: ভাত, আটা বা ময়দার রুটি, পাউরুটি, আলু, মিষ্টিআলু, মুড়ি, চিড়া, খৈ, চিনি, মধু প্রভৃতি।

চর্বি জাতীয় খাবার: তেল, মাখন, ঘি, মাছ-মাংসের চর্বি প্রভৃতি।

আমিষ জাতীয় খাবার: ডিম, মাছ,মাংস, কলিজা, ছোটমাছ, দুধ, সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল, বাদাম, সিমের বিচি প্রভৃতি।

ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ খাবার: (শাক, সবজি ও ফল জাতীয় খাবার) কচুশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক, পালংশাক, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, ছোটমাছ, দুধ, ডিম, কলিজা প্রভৃতি।

৪.২ পরিবারে যা মেনে চলতে হবে

- শাকসবজি ও ফলমূল কাটার আগে নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে
- খাবারে পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে অল্পতাপে, ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে এবং রান্নার শেষ দিকে আয়োডিনযুক্ত লবণ যোগ করতে হবে
- দিনে অন্তত ২ লিটার (৮ গ্লাস) নিরাপদ পানি পান করতে হবে
- সপ্তাহে ২টি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট
- ৬ মাস অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেতে হবে
- ভাতের সাথে লেবু ও কাঁচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যেতে হবে
- খাবার তৈরি ও গ্রহণের আগে এবং শৌচকর্মের পরে পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৪.৩ কিশোর-কিশোরীর দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা (২৫০ মি.লি বাটির হিসেবে)

সকালের খাবার: মাঝারি সাইজের ২টি রুটি অথবা ১ বাটি ভাত, ১ বাটি সবজি ও ১টি ডিম

সকালের নাস্তা (সকাল ১১টা): যে কোনো দেশী মৌসুমী রঙিন/কমলা রঙের ফল বা বাড়িতে তৈরি নাস্তা জাতীয় খাবার।

দুপুরের খাবার: ২/৩ বাটি ভাত, ১ বাটি সবজি, ১ বাটি ঘন ডাল ও ১ টুকরা মাছ/ মাংস/ কলিজা

বিকেলের নাস্তা: দুধ দিয়ে তৈরি ঘন যে কোনো খাবার (পায়েস বা দই ইত্যাদি) যে কোনো দেশী মৌসুমি ফল বা বাড়িতে তৈরি নাস্তা জাতীয় খাবার।

রাতের খাবার: ২/৩ বাটি ভাত, ১ বাটি সবজি, ১ বাটি ঘন ডাল ও ১ টুকরা মাছ।

৫. কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য

বয়ঃসন্ধিকালেই কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। তাই এসময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের প্রজনন শিক্ষা ও প্রজননতন্ত্রের সুস্থতা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। এ ধারণা সঠিক নয়; কারণ প্রজননক্ষম হবার সাথে সাথেই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেলে কিশোর-কিশোরীরা ভালভাবে নিজেদের যত্ন নিতে এবং লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

৫.১ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা

কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করাও জরুরি। সময়মত ও সঠিক প্রজননস্বাস্থ্য সেবার অভাবে কিশোর-কিশোরীরা মারাত্মক জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে।

প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিশোর-কিশোরীরা লজ্জা-সংকোচ বা ভয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা বা বিষয়গুলো নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। কখনো কখনো তারা হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ বা ওঝার স্মরণাপন্ন হয়, এতে তারা ভুল চিকিৎসা ও প্রতারণার শিকার হয়।

আমাদের দেশে অনেক মেয়েরই কৈশোরে বিয়ে হয়ে যায়। এদের জন্য প্রজননস্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন। সাধারণত কিশোর-কিশোরীদের

- প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা
- কৈশোরে বিয়ের কারণে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা
- কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের কারণে গর্ভ, প্রসব ও প্রসব পরবর্তী সেবার প্রয়োজন হয়।

৫.২ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে করণীয়

- প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হলে লজ্জা, সংকোচ বা ভীত না হয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার বা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে নিজের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে মা-বাবা বা পরিবারের বিশ্বস্ত বড় সদস্যদের সাহায্য নিতে হবে।
- ডাক্তার বা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর কাছে কোনো কিছু গোপন না করে সব কথা খুলে বলতে হবে, যাতে তারা সঠিক পরামর্শ ও সেবা দিতে পারেন।
- ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা নিতে হবে।

৫.৩ প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা;
- নিরাপদ যৌন আচরণ সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা;
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনরোগ সম্পর্কে জানা ও প্রতিরোধ করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা।

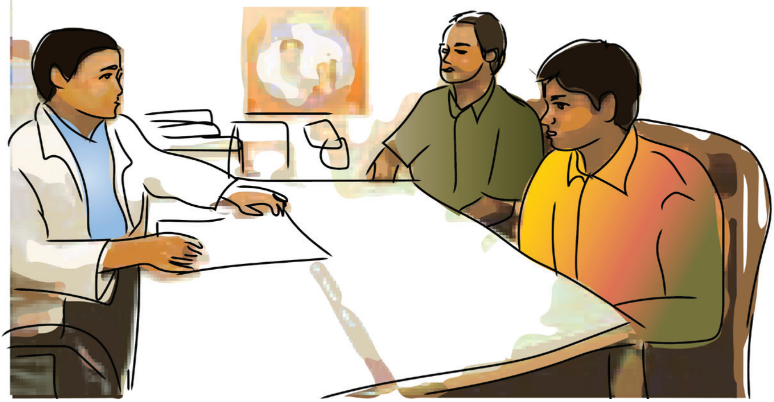

৫.৪ ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি। শিশুকালে মা-বাবা বা অভিভাবকরা ছেলে-মেয়ের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখেন। কৈশোর থেকে এই দায়িত্ব নিজেকে নিতে হয়। নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা, দাঁত মাজা, নখ কাটা, চুল, চোখ, নাক ও কানের যত্ন নেয়া, হাত ধোয়া ইত্যাদির পাশাপাশি প্রজনন অঙ্গের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস কৈশোর থেকেই গড়ে তোলা আবশ্যক।

৫.৫ মাসিক বা ঋতুস্রাব কি?

প্রতিমাসে মেয়েদের যোনিপথ দিয়ে যে রক্তস্রাব হয় তাকে ঋতুস্রাব বা মাসিক বলে। ঋতুস্রাব সাধারণত ১০-১৪ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয় এবং ৪৫-৫০ বছর পর্যন্ত প্রতিমাসে ১ বার করে হতে থাকে। প্রতিমাসেই ৩-৭ দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়ে থাকে।

৫.৬ মাসিক বা ঋতুস্রাবের সময় করণীয়

- কিশোরীদের মাসিক চলাকালে স্যানিটারি প্যাড বা পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করতে হবে। মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড় বা প্যাড প্রয়োজন অনুযায়ী বদলাতে হবে। মাসিকের সময় যদি কাপড় ব্যবহার করা হয় তবে তা পুনরায় ব্যবহারের আগে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার কোনো জায়গায় রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। একটি প্যাড মাত্র একবারই ব্যবহার করা যায়। পরিষ্কার কাপড় বা প্যাড ব্যবহার না করার কারণে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে যা, শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

স্যানিটারি ন্যাপকিন

সুতি কাপড়

- মাসিক বা ঋতুস্রাবের সময় কিশোরীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে। পরিমাণ মত পানি (দিনে অন্তত ৮ গ্লাস) পান করতে হবে।

৫.৭ মাসিক নিয়ে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার

মাসিকের সময় কিশোরীদের রান্নাঘরে ঢুকতে, মাছ-মাংস খেতে, খেলাধুলা করতে বা সন্ধ্যার পর বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়। মাসিক যেহেতু একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাই এসময় কিশোরীদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে উৎসাহিত করা উচিত।

৫.৮ মাসিকের সময় পরিবার ও স্কুলের সহযোগিতা

পরিবারের উচিত এই বিশেষ সময়ে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে কিশোরীদের উৎসাহিত করা। পরিবারের মা বা বোন বা বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো নারী সদস্য কিশোরীকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন। কখনো কখনো স্কুল চলাকালীন কোনো ছাত্রীর মাসিক শুরু হতে পারে। তাই প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জরুরি প্রয়োজনে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

৫.৯ স্বপ্নদোষ কি?

কিশোরদের স্বপ্নদোষের ফলে পরার কাপড় নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এ ধরণের অবস্থা হলে অবশ্যই সেই কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। অপরিষ্কার প্যান্ট বা লুঙ্গি পরার কারণে নানা ধরণের চুলকানি-পাঁচড়াজাতীয় সংক্রমণ হতে পারে এবং তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

৫.১০ নিরাপদ যৌন আচরণ

কৈশোরে কিশোর-কিশোরীদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও যৌনচিন্তার সৃষ্টি হয়। তাই এ সময়ে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে তা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সবদিক দিয়েই ক্ষতিকর হতে পারে। তারা অনেক সময় যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং লক্ষ্য করা যায় এই যৌন নির্যাতনকারীরা তাদের নিকট আত্মীয় বা পরিচিত জন। ভয়ে, লজ্জায় কিশোর-কিশোরীরা এসব নির্যাতনের কথা প্রকাশ না করে নীরবে সহ্য করে। যার পরিণতিতে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও যৌনরোগের মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫.১১ নিরাপদ যৌন আচরণের জন্য করণীয়

- ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন এবং শারীরিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে কিশোর-কিশোরীদের এ বয়সে যৌন আচরণের ক্ষেত্রে সংযত থাকাসহ পারিবারিক নৈতিক শিক্ষায় দীক্ষিত হতে হবে।
- যৌন চিন্তা মনে যাতে কম আসে সে জন্য পড়াশোনা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।
- অশ্লীল বইপত্র এবং ভিডিও বা সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- যৌন নির্যাতনের শিকার হলে অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা-বাবা বা বিশ্বস্ত কাছের ব্যক্তিকে বিষয়টি জানাতে হবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে নির্যাতনকারীই দোষী, যে নির্যাতিত হয় সে দোষী নয়।

৬. বাল্যবিয়ে, প্রজননতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ

৬.১ বাল্যবিয়ে কি?

আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী, বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর হতে হবে। এর আগে বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিয়ে বলে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বাল্যবিয়ে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।

৬.২ বাল্যবিয়ের পরিণতি

মানসিক বিকাশ ও শারীরিক বৃদ্ধির আগে অর্থাৎ অপরিণত বয়সে বিয়ে করলে মানসিক চাপ ও পরবর্তীতে সন্তানধারণের জন্য শারীরিক ধকলের মোকাবিলা করতে হয়। যা কিশোর-কিশোরীর মানসিক ও শারীরিক অনুস্থতার কারণ হয়ে থাকে।

- বাল্যবিয়ে হলে কিশোর-কিশোরীরা পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে না। তাই ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না।
- বাল্যবিয়ের কারণে কিশোরীরা অল্প বয়সে সন্তানধারণ করে। যার ফলে প্রসবকালীন জটিলতাসহ দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন রোগে (জরায়ু বের হয়ে আসা, ফিস্টুলা, প্রস্রাব ঝরা ইত্যাদি) ভোগে। এমনকি অকাল মৃত্যুর শিকার হয়ে থাকে।
- অপরিণত বয়সে বিয়ে হলে মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়।
  কিশোরী অবস্থায় শারীরিক এবং মানসিক পরিপক্বতা না থাকায় নিজের, পরিবারের ও সন্তানের সঠিক যত্ন নিতে পারে না।

৬.৩ বাল্যবিয়ে হয়ে গেলে করণীয়

কোনো কারণে যদি ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়েই যায় তবে অবশ্যই পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর পরামর্শমতো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

৬.৪ প্রজননতন্ত্র, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ

নারী ও পুরুষের যেসব অঙ্গের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হয় সেসব অঙ্গকে প্রজনন অঙ্গ বলে এবং এইসব অঙ্গগুলোকে একত্রে প্রজননতন্ত্র বলা হয়। নারী ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গগুলো ভিন্ন হয়ে থাকে।

নারী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে:

- ডিম্বাশয়
- ডিম্বনালী
- জরায়ু
- জরায়ুরমুখ (সার্ভিক্স)
- যোনিপথ বা সন্তান হবার রাস্তা

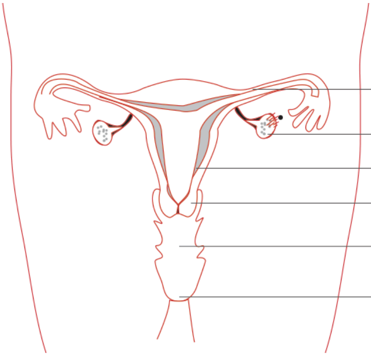

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে:

- অণ্ডকোষ
- পুরুষাঙ্গ বা লিঙ্গ
- অণ্ডকোষ থলি
- শুক্রবাহী নালী
- বীর্যথলি
- মূত্রনালী

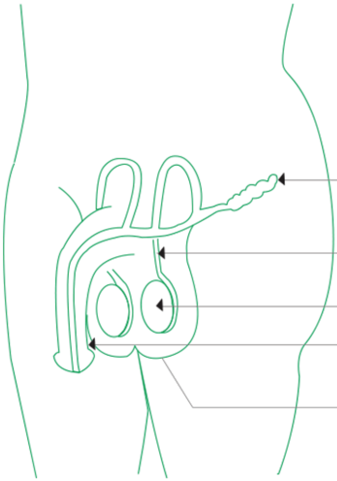

অনেক সময় এই প্রজননতন্ত্রের অঙ্গ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। এসকল সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে যৌনরোগ এবং অন্যান্য সংক্রমণ। যৌনমিলনের মাধ্যমে যেসব সংক্রমণ বা রোগ হয় তাকে যৌনরোগ বলে।

এছাড়া অন্যান্য ভাবেও প্রজননতন্ত্রের প্রদাহ হতে পারে। যেমন-সিফিলিস, গনো্রিয়া, ক্ল্যামিডিয়া, যৌনাঙ্গে ফুসকুড়ি, এইচআইভি ও এইডস এবং হেপাটাইটিস বি, সি ইত্যাদি। তবে হেপাটাইটিস এবং এইচআইভি ও এইডসসহ কিছু যৌনরোগ যৌন মিলন ছাড়া অন্যভাবেও সংক্রমিত হতে পারে, যেমন-আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, তার ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত মা থেকে সন্তানের মাঝে ছড়াতে পারে।

যৌনরোগ ছাড়া অন্যান্য সংক্রমণ মাসিকের সময় অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করলে এবং প্রসব বা গর্ভপাতের সময় নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও হতে পারে।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বা যৌনরোগ হলে সাধারনত পুরুষের ক্ষেত্রে যে ধরণের লক্ষণ দেখা যায় সেগুলো হলো-

- প্রস্রাবের রাস্তায় পুঁজ
- পুরুষাঙ্গে ঘা বা ক্ষত
- অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া ও ব্যথা
- ঘন ঘন প্রস্রাব
- প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া এবং ব্যথা
- কুচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বা যৌনরোগ হলে সাধারণত নারীদের ক্ষেত্রে যে ধরণের লক্ষণ দেখা যায় সেগুলো হলো:

- যোনিপথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
- যৌনাঙ্গে ক্ষত বা ঘা
- যৌনিপথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া
- তলপেটে খুব ব্যথা
- কুচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা
- সহবাসের সময় ব্যথা
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

বি. দ্র. সকলের ক্ষেত্রে সকল উপসর্গ একই রকম নাও হতে পারে। আবার সকল উপসর্গ এক সঙ্গে নাও থাকতে পারে। কিছু কিছু প্রজননতন্ত্রের প্রদাহ যেমন, ক্ল্যামিডিয়া ইনফেকশন বিশেষ কোন উপসর্গ ছাড়াই দীর্ঘদিন বিদ্যমান থাকতে পারে যা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা দেখা দিতে পারে।

সঠিক সময়ে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা না করালে পরবর্তীতে যে ধরণের জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো:

- নারী ও পুরুষ উভয়ের সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে
- নারী-পুরুষের যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে
- সন্তান নষ্ট হবার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে
- মৃত সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা থাকে
- জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে
- আক্রান্ত পুরুষের মূত্রনালী সরু হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি।

৬.৫ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ হলে করণীয়

- লজ্জা না করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটস্থ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল ও এনজিও ক্লিনিক থেকে পরামর্শ নেয়া জরুরি।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ খেতে হবে এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।
- পরবর্তীতে যেন এ ধরণের রোগ আর না হয় সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

৭. এইচআইভি ও এইডস কি?

এইচআইভি একটি ভাইরাস, এই ভাইরাস থেকে এইডস হয়। এইচআইভি মানুষের শরীরে ঢোকার পর ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট্ করে দেয়, শরীরের এই অবস্থাকে এইডস বলে। এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করার পর থেকে এইডস হিসাবে প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। তবে একবার এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করলে কোনো না কোনো সময় এইডস দেখা দেবেই। এইডস-এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু।

৭.১ এইচআইভি কিভাবে ছড়ায়

- যার শরীরে এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে এমন কারো সাথে অনিরাপদ যেকোন ধরণের যৌন মিলন হলে;
- এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে এমন ব্যক্তির রক্ত অন্য কারো শরীরে সঞ্চালন করা হলে;
- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ, সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে;
- এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত মা থেকে গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় সন্তানের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে;
- আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার মাধ্যমেও সন্তানের মাঝে এর সংক্রমণ হতে পারে।

৭.২ এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় না

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় আর কিভাবে ছড়ায় না এটা নিয়ে অনেকের মাঝে নানা ধরণের ভুল ধারণা এবং কুসংস্কার প্রচলিত আছে। দেখা যায় কোথাও এইডস রোগী আছে জানলে অন্যদের মধ্যে ভয়-ভীতি কাজ করে। অনেকে মনে করেন রোগীর কাছে গেলেই তিনি এইডস -এ আক্রান্ত হয়ে যাবেন। এ ভুল ধারণার কারণে অনেকেই এইডস রোগীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে তার জীবন বিপন্ন করে তোলে। তাই এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় সেটা যেমন জানতে হবে, পাশাপাশি কিভাবে ছড়ায় না সেটাও সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় সেটা পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৭.৩ এইডস কিভাবে ছড়ায় না

- হাঁচি,কাশি, কফ-থুথু বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে
- একসাথে এক ঘরে বসবাস করলে বা এক বিছানায় ঘুমালে
- একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া-দাওয়া করলে
- একসাথে খেলাধুলা বা একই স্কুলে পড়াশোনা করলে
- মশা বা কোনো পোকা-মাকড়ের কামড়ে
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় ব্যবহার করলে
- হাত মেলালে বা কোলাকুলি করলে
- একই বাথরুম ব্যবহার করলে বা একই পুকুরে গোসল করলে এইচআইভি ছড়ায় না।

৭.৪ এইচআইভি-তে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণসমূহ

সাধারণ লক্ষণ:

- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা কাশি;
- সারা দেহে চুলকানিজনিত চর্মরোগ;
- বার বার সারা দেহে ‘হারপিস জস্টার’; (বিশেষ ধরণের চর্মরোগ) এর সংক্রমণ;
- মুখ ও গলায় ফেনাযুক্ত এক ধরণের ঘা/ছত্রাক ঘা (আঠালো);
- লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া;
- স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া;
- ক্লান্তি ও ক্ষুধহীনতা দেখা দেয়া।

মারাত্মক লক্ষণ:

- শরীরের ওজন শতকরা ১০ ভাগের বেশি কমে যাওয়া;
- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা থেমে থেমে পাতলা পায়খানা হওয়া;
- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা জ্বর অথবা জ্বর জ্বর ভাব থাকা।

৭.৫ এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে করণীয়

এইডস-এর কোনো চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। উন্নত বিশ্বের কোনো কোনো ওষুধ এইচআইভি ভাইরাসকে পুরোপুরি কার্যকর হওয়াকে কিছুটা বিলম্বিত করতে পারে। তবে সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এইচআইভি থেকে রক্ষা পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো প্রতিরোধ করা, যেমন-

- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা
- যৌন মিলনের সময় সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করলেই যৌনরোগসহ এইচআইভি প্রতিরোধ করা সম্ভব
- ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা
- রক্ত গ্রহণের আগে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যে তা এইচআইভি মুক্ত
- যৌন রোগের লক্ষণ দেখা গেলেই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া এবং সে অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা গ্রহণ করা।

৮. পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ যেখান থেকে পাওয়া যায়

- পরিবার কল্যাণ সহকারী
- কমিউনিটি ক্লিনিক
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
- জেলা সদর হাসপাতাল
- আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা
- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
- এনজিও ক্লিনিক
- বেসরকারি ক্লিনিক।

কমিউনিটি ক্লিনিক

ছেলে হোক, মেয়ে হোক
দু'টি সন্তানই যথেষ্ট
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
উপজেলা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা
স্যাটেলাইট ক্লিনিক
গ্রাম: খোলামোড়া
ইউনিয়ন: কালিন্দি ইউনিয়ন

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
ইউনিয়ন: তারানগর
থানা: কেরানীগঞ্জ, জেলা-ঢাকা।
পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ

১০ শয্যা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

কিশোর-কিশোরীদের যা প্রয়োজন

কৈশোরকে অবহেলা নয়
জীবন গড়ার এইতো সময়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর